বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব-ভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

॥ ১৩৫২ ॥

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩৫৩ ॥

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রাচীন বাংলার গৌরব

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

'প্রাচীন বাংলার গৌরব' ১৩২১ সালে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের
অষ্টম অধিবেশনে সভাপতির সম্বোধনরূপে পঠিত হয়।

প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

১

হস্তিচিকিৎসা

বেদের আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হাতী চিনিতেন না। কারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতী পাওয়া যায় না। বেদের আর্যজাতির প্রধান কীর্তি ঋগ্বেদে 'হস্তী' শব্দটি পাঁচ বার মাত্র পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণাচার্য অর্থ করিয়াছেন, হস্তযুক্ত ঋত্বিক্ বা পদযুক্ত ঋত্বিক্। দুই জায়গায় তিনি অর্থ করিয়াছেন, হাতী। সে দুইটি জায়গা এই—

মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো
গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা
যদারুণীষু তবিষীরয়ুগ্ধ্বং॥ ১।৬৪।৭

হে মরুৎগণ, তোমরা বড় লোক, জ্ঞানবান; তোমাদের দীপ্তি অতি বিচিত্র। তোমরা পাহাড়ের মত আপন বলে বলীয়ান। তোমরা হস্তী মৃগের মত বনগুলি খাইয়া ফেল। অরুণবর্ণ দিক্‌সমূহে তোমার বল যোজনা কর।

শূর উপাকে তন্বং দধানো
বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।
মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ
সিংহো ন ভীমঃ আয়ুধানি বিভ্রৎ॥ ৪।১৬।১৪

হে ইন্দ্র, তুমি যখন সূর্যের নিকটে আপনার রূপ বিকাশ কর, তখন সে রূপ মলিন না হইয়া আরও উজ্জ্বল হয়। পরের বলনাশক হস্তী মৃগের ন্যায় তুমি আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের মত ভয়ংকর হও।

এ দুই জায়গায়ই, হস্তী মৃগের ন্যায়, 'মৃগা ইব হস্তিনঃ', 'মৃগো ন হস্তী' এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, উঁহারা হস্তী নূতন দেখিতেছেন। উহাকে মৃগবিশেষ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। তাই তাঁহারা মৃগজাতীয় হাতী বলিয়া উহার উল্লেখ করিতেছেন। পলিনেসিয়ায় ওটাহিটি দ্বীপের লোক কেবল শূকর চিনিত। ইউরোপীয়েরা যখন সেখানে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, আরও নানারকম জানোয়ার লইয়া গেলেন, তখন তাহারা ঘোড়াকে বলিল চিঁ-হিঁ-হিঁ শূয়ার, কুকুরকে বলিল ঘেউ-ঘেউ শূয়ার, ভেড়াকে বলিল ভ্যা-ভ্যা শূয়ার। আর্যগণ সেইরূপ মৃগ চিনিতেন, কেননা তাঁহারা শিকারে খুব মজবুত ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া যখন তাঁহারা হাতী দেখিলেন, তখন তাঁহারা তাহাকে হাতওয়ালা মৃগ বলিলেন।

হাতীর আসল বাসস্থান বাংলা, পূর্ব-উপদ্বীপ, বোর্নিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ। পশ্চিমে দেরাদুন পর্যন্ত হাতী দেখা যায়, দক্ষিণে মহিসুর ও লঙ্কায় দেখা যায়। আফ্রিকায়ও হাতী দেখা যায়, কিন্তু এত বড় নয়, এত ভালও নয়। সুতরাং বৈদিক আর্যেরা যে হাতীর বিষয় অল্পই জানিতেন, সেকথা একরকম স্থির।

ঋগ্বেদে হাতীর নাম ত ঐ দুইবার আছে। ও যে ঠিক হাতীরই নাম, সে বিষয়েও একটু সন্দেহ। কারণ, 'হাতওয়ালা' মৃগ বলিতেছে, যদি স্পষ্ট করিয়া 'শুঁড়ওয়ালা' বলিত, তবে কোন সন্দেহই থাকিত না। আরও সন্দেহের কারণ এই যে, সংস্কৃতে হাতীর অনেক নাম আছে— করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ— ইহার একটি শব্দও ঋগ্বেদে নাই.

এমন কি ঐরাবতের নাম পর্যন্তও নাই। যাহারা কালো হাতীই চিনিত না, তাহারা সাদা হাতী কেমন করিয়া জানিবে?

ঋগ্বেদে হাতীর নাম থাকুক বা না থাকুক, তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহার নাম আছে। অশ্বমেধের কথা বলিতে বলিতে, যখন কোন্ দেবতাকে কোন্ জানোয়ার বলি দিতে হইবে এই প্রশ্ন উঠিল, তখন প্রথম এগারোজন দেবতাকে বন্য জন্তু দিতে হইবে স্থির হইল। কোন কোন মতে এই বন্য জন্তুর ছবি বলি দিলেই হইল; কোন কোন মতে বলিল, "না, যেমন গ্রাম্য জন্তুর বেলায় আসলেরই ব্যবস্থা, বন্য জন্তুর বেলাও সেইরূপ।" এই দেবতা ও জন্তুদিগের নাম যথা— রাজা ইন্দ্রকে শূকর দিতে হইবে, বরুণরাজাকে কৃষ্ণসার হরিণ দিতে হইবে, যমরাজাকে ঋষ্য মৃগ দিতে হইবে, ঋষভদেবকে গবয় বা নীল গাই দিতে হইবে, বনের রাজা শার্দূলকে গৌর মৃগ দিতে হইবে, পুরুষের রাজাকে মর্কট দিতে হইবে, শকুনরাজ বা পক্ষিরাজকে বর্তক পাখী দিতে হইবে, নীলঙ্গ সর্পরাজকে ক্রিমি দিতে হইবে, ওষধিদের রাজা সোমকে কুলঙ্গ দিতে হইবে, সিন্ধুরাজকে শিংশুমার দিতে হইবে, আর হিমবান্‌কে হস্তী দিতে হইবে।

ঋগ্বেদে হিমবান্ বলিয়া দেবতার কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবার হিমবন্ত শব্দ আছে, তাহার অর্থ বরফের পাহাড়— ঐ পাহাড় ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় হিমবান্ দেবতা হইয়াছেন এবং বন্য হস্তী, এখন আর্যগণ যাহা ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বলি হইয়াছে। হিমবানের দেবতা হওয়া ও বন্যহস্তীর তাঁহার বলি হওয়া, এই দুই ঘটনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে. আর্যগণ এখন ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন।

হিমবান্ এককালে দেবতা ছিলেন না, পরে দেবতা হইয়াছেন।

ইহার একটা কারণ বিষ্ণুপুরাণে দেওয়া আছে। সে পুরাণে প্রজাপতি বলিতেছেন, "আমি যজ্ঞের উপকরণ সোমলতাদির উৎপত্তির জন্য হিমালয়ের সৃষ্টি করিয়াছি।" তাই দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন, যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয়ের দেবত্ব পরে প্রজাপতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞে তাঁহার ভাগও একটু পরে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। বুদ্ধদেব কুস্তি করিতে করিতে একটা হাতী শুঁড় ধরিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, তাহাতে হাতী যেখানে পড়ে সেখানে একটি ফোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। উদয়ন রাজার 'নলাগিরি' নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী ধরারও খুব ব্যবস্থা ছিল।

এই যে হাতী ধরা ও পোষ মানানো, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা—এসব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। যে দেশের একদিকে হিমালয়, একদিকে লৌহিত্য ও একদিকে সাগর—সেই দেশেই হস্তিবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতীর সঙ্গে বেড়াইতেন, হাতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাকিতেন, হাতীর সেবা করিতেন, হাতীর পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমন কি একরকম হাতীই হইয়া গিয়াছিলেন। হাতীরা যেখানে যাইত, তিনিও সেইখানেই যাইতেন। কোনদিন পাহাড়ের চূড়ায়, কোনদিন

নদীর চড়ায়, কোনদিন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, হাতীর সঙ্গেই তাঁহার বাস ছিল। হাতীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত, তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার মনের মত খাবার জোগাইয়া দিত, ব্যারাম হইলে তাঁহার শুশ্রূষা করিত।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার শখ হইল, 'হাতী আমার বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতী চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি করিয়া হাতীর উপরে চড়িয়া বেড়াইব।' কিন্তু হাতী কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত ঋষিদের নিমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিরা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতীর দল আছে, খোঁজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম 'শৈলরাজাশ্রিত', 'পুণ্য' এবং সেখানে 'লৌহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে'। সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও ঋষিদিগকে খবর দিল। রাজা সসৈন্য সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঋষি আশ্রমে নাই ; তিনি হস্তিসেবার জন্য দূরে গমন করিয়াছেন। রাজা হাতীর দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদের পরামর্শমত হাতীশালা তৈয়ার করিয়া সেখানে হাতীদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতীগুলি নাই। তিনি চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেকদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া

গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা-পাতা, শিকড়-মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে, তাঁহার ও তাঁহার হাতীদের মহা আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন— তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুনি কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। ঋষিরা আসিলেন, তাঁহাদের সহিতও কথা কহিলেন না। রাজা নিজে আসিলেন, মুনি তাঁহার সহিতও কথা কহিলেন না। শেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তিচিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' বা 'পালকাপ্য'। উহা প্রাচীন সূত্রের আকারে লেখা। অনেক জায়গায় পদ্য আছে, অনেক জায়গায় গদ্যও আছে। আধুনিক সূত্র সকল কেবল বিভক্তিযুক্ত পদ, তাহাতে ক্রিয়াপদ নাই। প্রাচীন সূত্রে যথেষ্ট ক্রিয়াপদ আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে 'ব্যাখ্যাস্যামঃ' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা আছে। প্রাচীন সূত্রের সহিত পালকাপ্যের প্রভেদ এই যে, এখানে রাজা ও মুনির কথোপকথনচ্ছলে সূত্র লেখা

হইয়াছে। ভরত-নাট্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন সূত্রে এরূপ কথোপকথন নাই। বোধ হয়, কোন একখানি প্রাচীন হস্তিসূত্র পরে পুরাণের আকারে লেখা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে যে, ঋষি বলিলেন, "কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম।" কিন্তু চেন্তসাল রাও সি. আই. ই. যে 'গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্বম্' সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। অর্থাৎ যে সকল গোত্র-প্রবরের গ্রন্থ এ দেশে চলিত আছে, তাহার কোথাও কাপ্যগোত্রের নাম নাই। তবে পালকাপ্য কিরূপে কাপ্যগোত্রের লোক হইলেন, কিরূপেই বা তাঁহাকে আর্য বা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই পুস্তকের প্রথমে লোমপাদ যে সকল মুনিদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাপ্য বলিয়া একজন মুনি আছেন, আশ্বলায়ন-বৌধায়নাদির সূত্রে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি আর্যগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধ হয় বাংলা দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের ধারে, সমুদ্র ও হিমালয়ের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরে তাঁহার আয়ুর্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাংলাদেশেরই লোক। এই যে প্রকাণ্ড জন্তু হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা— এ সমস্তই বাংলা দেশে হইয়াছিল। পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন, উহা অন্য কোন ভাষা হইতে সংস্কৃতে তর্জমা করা হইয়াছে; অনেক সময় মনে হয়, উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে চলিতেছে না। এ গ্রন্থ যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করা অসম্ভব। কালিদাস ইহাকে অতি প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়া

গিয়াছেন। রঘুর ষষ্ঠ সর্গে তাঁহার সুনন্দা অঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং সূত্রকারেরা ইঁহার হাতীগুলিকে শিক্ষা দিয়া যান, সেই জন্যই ইনি পৃথিবীতে থাকিয়াই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'হস্তিপ্রচার' অধ্যায়ে হস্তিচিকিৎসকের কথা আছে। পথে যদি হাতীর কোন অসুখ হয়, মদক্ষরণ হয়, অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিবিধান করিবেন, ইহার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং কৌটিল্যেরও পূর্বে যে হস্তিচিকিৎসার একটি শাস্ত্র ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে আকারে পালকাপ্যের সূত্র লেখা, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, উহা অতি প্রাচীন। সুতরাং ম্যাক্সমুলার যাহাকে Suttra Period বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন খৃস্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারও আগে বশিষ্ঠ ও গোতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়।

ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সূত্ররচনার কাল আরও একটু আগে হইবে, কিন্তু সে কথা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাংলা দেশে হস্তিচিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

২

নানা ধর্মমত

পূর্বে অনেক জায়গায় আভাস দিয়াছি যে, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, আজীবক ধর্ম এবং যে সকল ধর্মকে বৌদ্ধেরা তৈথিক মত বলিত, সে সকল ধর্মই বঙ্গ মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্যজাতির ধর্মের উপর উহা তত্তটা নির্ভর করে না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এরূপ মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। এই সকল ধর্মেরই উৎপত্তি পূর্বভারতে বঙ্গ মগধ ও চের জাতির অধিকারের মধ্যে, যে সকল দেশের সহিত আর্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সে সকল দেশের বাহিরে। এ সকল ধর্মই বৈরাগ্যের ধর্ম। বৈদিক আর্যদের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের ধর্ম। ঋগ্বেদে বৈরাগ্যের নাম গন্ধও নাই। অন্যান্য বেদেও যাগযজ্ঞের কথাই অধিক, সেও গৃহস্থেরই ধর্ম। সূত্রগুলিতেও গৃহস্থের ধর্মের কথা। এক ভাগ সূত্রের নামই ত গৃহ্যসূত্র। সূত্রগুলিতে চারি আশ্রম পালনের কথা আছে। শেষ আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম। ভিক্ষুর আশ্রমেও বিশেষ বৈরাগ্যের কথা দেখা যায় না। এ আশ্রমের লোক ভিক্ষা করিয়াই খাইবেন, এই কথাই আছে। কিন্তু আমরা যে সকল ধর্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই বলিতেছে গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করো। গৃহস্থ-আশ্রমে কেবল দুঃখ। গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম, জরা, মরণ— এই ত্রিতাপ নাশ হয় তাহারই ব্যবস্থা করো। আর তাহা নাশ করিতে গেলে "আমি কে?", "কোথা হইতে আসিলাম?", "কেন আসিলাম?" —এই সকল বিষয় চিন্তা

করিতে হয়। সেই চিন্তার ফলে কেহ বলেন আত্মা থাকে, কিন্তু সে 'কেবল' হইয়া যায়, সংসারের সহিত তাহার আর কোন সংস্রব থাকে না, সুতরাং সে জরামরণাদির অতীত। কেহ বলেন, তাহার অহংকার থাকে না; যখন তাহার অহংকার থাকে না, তখন সে সর্বব্যাপী হয়, সর্বভূতে সমজ্ঞান হয়, মহাকরুণার আধার হইয়া যায়। এ সকল কথা বেদ ব্রাহ্মণ বা সূত্রে নাই। এ সব ত গেল দর্শনের কথা, চিন্তাশক্তির কথা, যোগের কথা।

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে, এই সকল ধর্মের ও আর্যধর্মের আচার-ব্যবহারে মিল নাই। আর্যগণ বলেন, পরিষ্কার কাপড় পরিবে, সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, নিত্য স্নান করিবে। জৈনেরা বলেন, উলঙ্গ থাকো, গায়ের মলা তুলিও না, স্নান করিও না। মহাবীর মলভার বহন করিতেন। অনেক জৈন যতি গৌরব করিয়া 'মলধারী' এই উপাধি ধারণ করিতেন। আর্যগণ উষ্ণীষ, উপানহ ও উপবীত ধারণ করিতেন; তাঁহারা খালি মাথায় থাকিতেন, জুতা পরিতেন না, এক ধুতি ও এক চাদরেই কাটাইয়া দিতেন। আর্যগণ সর্বদাই খেউরি হইতেন। অনেক ধর্মসম্প্রদায় একেবারে খেউরি হইত না। তাহাদের নখ চুল কখনো কাটা হইত না। আর্যেরা মাথা মুড়াইলে মাথার মাঝখানে একটা টিকি রাখিতেন। বৌদ্ধেরা সব মাথা মুড়াইয়া ফেলিত। আর্যগণ দিনে একবার খাইতেন, রাত্রিতে একবার খাইতেন। বৌদ্ধেরা বেলা বারোটার মধ্যে আহার করিত; বারোটার মধ্যে আহার না হইয়া উঠিলে তাহাদের সেদিন আর আহারই হইত না। রাত্রিতে তাহারা রস বা জলীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিত না। খাট ছাড়া আর্যগণের শয়ন হইত না। বৌদ্ধেরা উচ্চাসন মহাসন একেবারে ত্যাগ করিত, তাহারা মাটিতেই শুইয়া থাকিত। আর্যগণ সংস্কৃতে লেখাপড়া করিতেন;

অন্য সকল ধর্মের লোক নিজ দেশের ভাষাতেই লেখাপড়া করিত।

ইহারা এত নূতন জিনিস কোথা হইতে পাইল? এ সকল নূতন জিনিস যখন আর্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা আর্যদের নিকট হইতে সে সব পায় নাই। উত্তর হইতে তাহারা এই সব জিনিস পাইতে পারে না, কেন না উত্তরে হিমালয় পর্বত। হিমালয়ের উত্তরদেশের লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। দক্ষিণ হইতেও ঐ সব জিনিস আসিতে পারে না, কেননা দক্ষিণের সহিত তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যাহা কিছু উহারা পাইয়াছে, পূর্বাঞ্চল হইতেই পাইয়াছে এবং পূর্বাঞ্চলেই আমরা এই সকল নূতন জিনিস কতক কতক এখনও দেখিতে পাই।

জৈনদের শেষ তীর্থংকর মহাবীর ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর কিছুদিন বৈশালির জৈনমন্দিরে বাস করেন, তাহার পর বারো বৎসর নিরুদ্দেশ থাকেন। এ সময় তিনি পূর্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিতেন। বারো বৎসরের পর তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া বৈশালিতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারও পূর্বের তীর্থংকর পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন, ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, তাহার পর নানাদেশে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণও পূর্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি সমেতগিরিতে বাস করেন— সমেতগিরি পরেশনাথ পাহাড়। তাঁহারও পূর্বে যে বাইশ জন তীর্থংকর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেত-গিরিতেই বাস করিতেন ও সেইখানেই দেহ রক্ষা করেন।

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্মেরই আদি। সাংখ্যের দেখাদেখিই জৈনেরা কেবলী হইতে চাহিত, কৈবল্য চাহিত। বৌদ্ধেরা বলেন, তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সাংখ্য-মত আর্য মত নহে,

উহার উৎপত্তি পূর্বদেশে। কতকগুলি আধুনিক সময়ের উপনিষৎ ও মনু প্রভৃতি কয়েক জন শিষ্টলোক উহার আদর করায়, শঙ্কর উহার খণ্ডন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার মতে উহা শিষ্টগণের গ্রাহ্য নহে। উপনিষদে যে সাংখ্য-মত আছে, শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন না— বলেন, ও সকলের অর্থ অন্যরূপ। সাংখ্যকার কপিলের বাড়ি পূর্বাঞ্চলে, পঞ্চশিখের বাড়িও পূর্বাঞ্চলে। মহাভারতের শান্তিপর্ব 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং' বলিয়া আরম্ভ করিয়া এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছে যে, পঞ্চশিখ জনকরাজার রাজসভায় আসিয়া রাজাকে উপদেশ দেন। সাংখ্য-মত যে পূর্বাঞ্চলের, এ কথা অনেক বার বলিয়াছি। তাই আর এখানে বেশী করিয়া বলিব না।

৩

রেশম

বাংলার তৃতীয় গৌরব রেশমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীনদেশ হইতে রেশমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেশমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার, চীনই রেশমের জন্মস্থান; চীনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খ্রীস্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্বে চীনের রানী তুঁত গাছের চাষ আরম্ভ করেন। রেশমের ব্যাবসা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে অনেক লেখাপড়া আছে। চীনেরা রেশমের চাষ কাহাকেও শিখিতে দিত না। ঐটি তাহাদের উপনিষৎ বা গুপ্ত বিদ্যা ছিল। জাপানীরা অনেক কষ্টে খ্রীস্টের তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেশমের চাষ শিক্ষা করে। ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাষ আরম্ভ করেন। ইউরোপে খ্রীস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থলপথে চীনের সহিত রেশমের ব্যাবসা চলিত। অনেকে মনে করেন, এই রেশমের ব্যাবসার জন্যই পঞ্জাবের শকরাজারা বেশী করিয়া সোনার টাকা চালান। ইউরোপে রেশমের চাষ ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাংলা দেশে খ্রীস্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব হইত। রেশমের খুব ভাল কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ' অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে পশম বাহির করে, সেই পশমের কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণ'। সেই পত্রোর্ণ তিন জায়গায় হইত— মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে।

নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল আর বটগাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হল্‌দে রঙের রেশম হইত, লিকুচের পোকা হইতে যে রেশম বাহির হইত তাহার রঙ গমের মত, বকুলের রেশমের রঙ সাদা, বট ও আর আর গাছের রেশমের রঙ ননীর মত। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের 'পত্রোর্ণ' সকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই কৌষেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্টবস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জমা। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ভাল জিনিস রাজকোষে রাখিয়া দিতে হইবে তাহার তালিকা আছে, সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে ঐ সকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম 'কোষপ্রবেশ্যরত্নপরীক্ষা'। এখানে রত্ন শব্দের অর্থ কেবল হীরা জহরত নয়, যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট সেইটির নাম রত্ন। এই রত্নের মধ্যে অগুরু আছে, চন্দন আছে, চর্ম আছে, পাটের কাপড় আছে, রেশমের কাপড় আছে ও তুলার কাপড় আছে। যে অংশ তর্জমা হইল, তাহাতে মগধ ও পৌণ্ড্রদেশের নাম আছে, এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ— দক্ষিণ-বেহার। আর পৌণ্ড্র— বারেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরাণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটি সোনার মত রাঙা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগকেশরের গাছ। নাগকেশর বাংলার আর কোনখানে বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ মাদারগাছ। মাদারগাছেও রেশমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও

বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যে ভাবে চীনদেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীনদেশের রেশমী কাপড় অপেক্ষা বাংলার রেশমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেশমী কাপড় যে চীন হইতে বাংলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেশম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাংলার রেশমের তুঁতগাছের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং বাঙালী যে রেশমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে, এ কথা বলিবার জো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেশমের চাষ বাংলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেশমের চাষ চীন হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে রেশমের চাষ ছিল, এ কথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাংলায় ও মগধেই রেশমের চাষ ছিল। কারণ, পৌণ্ড্রও বাংলায়, সুবর্ণকুড্যও বাংলায়। চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেশমের চাষ হইত। কারণ, মান্দাসোরে খ্রীস্টীয় ৪৭৬ অব্দে যে শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে এক দল রেশম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আসিয়া রেশমের ব্যাবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির নির্মাণ করে।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলার বড়ই গৌরবের কথা। যদি বাঙালীরা সকলের আগে রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্বপ্রথম উহার আরম্ভ হয়, তথাপি বাঙালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারা ত আর তুঁতপাতা হইতে রেশম বাহির করিতেন না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যে সকল গাছ বিনা

চাষে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, সে সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেশম বাহির করিতেন। চীনের রেশম সবই সাদা, তাহা রঙ করিতে হয়। বাংলার রেশম রঙ করিতে হইত না, গাছ-বিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সূতা হইত। আর, এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

৪

বাকলের কাপড়

বাংলায় চতুর্থ গৌরব বাকলের কাপড়। প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত। কটকের জঙ্গলমহলে এখনও দু-এক জায়গায় লোকে পাতা পরিয়া থাকে। তাহার পর লোকে বাকল পরিত ; গাছের ছাল পিটিয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া লইত, তাহাই জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিত এবং কাঁধের উপর একখানি ফেলিয়া উত্তরীয় করিত। সাঁচী পাহাড়ের উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, উহার চারিদিকে পাথরের রেলিং আছে, রেলিংএর চারিদিকে বড় বড় ফটক আছে। দুই-দুইটি থামের উপর এক-একটি ফটক। এই থামের গায়ে অনেক চিত্র আছে। এই চিত্রের মধ্যে বাকল-পরা অনেক মুনিঋষি আছেন। তাঁহাদের কাপড় পরার ধরন দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কেমন করিয়া সেখানে লোকে বাকল পরিয়া থাকিত। তাহার পর লোকে আর বাকল পরিত না, বাকল হইতে সুতা বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত ; শণ, পাট, ধঞ্চে, এমন কি আতসী গাছের ছাল হইতেও সুতা বাহির করিত। এখন এই সকল সুতায় দড়ি ও থলে হয়। সেকালে উহা হইতে খুব ভাল কাপড় তৈয়ার হইত এবং অনেক কাপড় খুব ভালও হইত। বাকল হইতে যে কাপড় হইত তাহার নাম 'ক্ষৌম', উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম 'দুকূল'। ক্ষৌম পবিত্র বলিয়া লোকে বড় আদর করিয়া পরিত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাংলাতেই এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গে দুকূল হইত, উহা শ্বেত ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। পৌণ্ড্রে ও দুকূল হইত, উহা শ্যামবর্ণ ও মণির মত উজ্জ্বল।

সুবর্ণকুড্যে যে দুকূল হইত তাহার বর্ণ সূর্যের মত এবং মণির মত উজ্জ্বল। এই অংশের শেষে কৌটিল্য বলিতেছেন, ইহাতেই কাশীর ও পৌণ্ড্র দেশের ক্ষৌমের কথা 'ব্যাখ্যা' করা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, বাংলাতেই বাকলের কাপড় সকলের চেয়ে ভাল হইত এবং 'দুকূল' একমাত্র বাংলাতেই হইত। সুতরাং ইহা আমরা বাংলার চতুর্থ গৌরবের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

এখানে আমরা কাপাসের কাপড়ের কথা বলিলাম না। কারণ, চাণক্যের মতে কাপাসের কাপড় যে শুধু বাংলাতেই ভাল হইত, এমন নয়— মথুরার কাপড়, অপরান্তের কাপড়, কলিঙ্গের কাপড়, কাশীর কাপড়, বৎসদেশের কাপড় ও মহিষদেশের কাপড়ও বেশ হইত। মথুরা পাণ্ড্যদেশে, মহিষদেশ নর্মদার দক্ষিণ, অপরান্ত বোম্বাই অঞ্চলে। কিন্তু চাণক্যের অনেক পরে কাপাসের কাপড়ও বাংলার একটা প্রধান গৌরবের জিনিস হইয়াছিল। ঢাকাই মস্‌লিন ঘাসের উপর পাড়িয়া রাখিলে ও রাত্রিতে তাহার উপর শিশির পড়িলে, কাপড় দেখাই যাইত না। একটি আংটির ভিতর দিয়া এক থান মস্‌লিন অনায়াসেই টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া যাইত। তাঁতীরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া একটি বাখারির কাটি লইয়া কাপাসের খেতে ঢুকিত। ফট্ করিয়া যেমন একটি কাপাসের মুখ খুলিয়া যাইত, অমনি বাখারিতে জড়াইয়া তাহার মুখের তুলাটি সংগ্রহ করিত। সেই তুলা হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতা পাকাইত, তাহাতেই মস্‌লিন তৈয়ার হইত। আকবর যখন বাংলা দখল করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন সুবাদারের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি বাংলার রাজস্ব-স্বরূপ বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র লইবেন, কিন্তু দিল্লীর রাজবাড়িতে যত মালদহের রেশমী কাপড় ও ঢাকার মস্‌লিন দরকার হইবে, সমস্ত সুবাদারকে জোগাইতে হইবে।

৫

থিয়েটার

প্রাচীন বাংলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার। থিয়েটারের সেকালের নাম 'প্রেক্ষাগৃহ' বা 'পেকৃথা ঘরঅ'। ইউরোপের অনেক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে থিয়েটার ছিল না, থিয়েটারের ব্যাপার গ্রীস হইতে এখানে আসিয়াছে, থিয়েটার রাজাদের নাচঘরে থাকিত। এ কথা একেবারে ঠিক নয়। আমাদের নিজ গৌরবের কথা আলোচনা করিতেছি। পরনিন্দায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, এক সময়ে দেবাসুরের ঘোর দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে জিতিয়া ইন্দ্র এক ধ্বজা খাড়া করিয়া দেন। ধ্বজার নীচে দেবতার দল আমোদ আহ্লাদ করিতে থাকেন। আমোদ করিতে করিতে তাঁহারা দেবাসুরের যুদ্ধ অভিনয় করিয়া বসিলেন। দেবতারা দেখিলেন যে, "বা! ইহাতে ত বেশ আমোদ হয়। যখনই শক্রধ্বজ তুলা যাইবে, তখনই এই রকম অভিনয় করিতে হইবে।" অসুরেরা বলিল, "বা! আমাদের ছোট করিবার জন্য তোমরা একটা নূতন কীর্তি করিবে, ইহা আমরা কিছুতেই হইতে দিব না।" এই বলিয়া তাহারা অভিনয় ভাঙিয়া দিবার জোগাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া এক বাঁশ লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। অসুর মারিতে মারিতে বাঁশের ডগাটি ছেঁচিয়া গেল, তাহার নাম হইল 'জর্জর'। জর্জর সেই অবধি নাটকের নিশান হইল। প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ার করিতে গেলে আগে জর্জর পুঁতিতে হইত, নাটক আরম্ভ করিতে গেলে আগে জর্জরের পূজা করিতে হইত।

পহ্লব বলিত; প্রথম প্রথম উহাদের নাম ছিল পাথ্ব। এখন ঐ প্রাচীন জাতিকে পুরাণে পারদ বলে। ভরতসূত্র যদি খ্রীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্বে লেখা হয় তাহা হইলে তাহারও পূর্বে অনেক নাট্য-সম্প্রদায় ছিল। পাণিনিতে আমরা দুইখানি নটসূত্রের নাম পাই, এক-খানি শিলালির, অপরটি কৃশাশ্বের। ভাসের নাটকে আছে যে, বৎসরাজ উদয়ন সূত্রকার ভরতকে আপনার পূর্বপুরুষ মনে করিয়া অত্যন্ত গর্বিত হইয়াছিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্রবৃত্তির অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চার রকম ছিল। সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম— আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড্রমাগধী। দাক্ষিণাত্যের লোকে নাটকে নৃত্য গীত বাদ্য বেশী বেশী দেখিতে ভালবাসিত, তাহারা অভিনয়ও ভালবাসিত, কিন্তু উহা চতুর মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এইরূপ পূর্বাঞ্চলের লোকেরও একটা প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওড্রমাগধী। ওড্রমাগধী প্রবৃত্তি যে সকল দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ, বঙ্গদেশ হইতেই মলচ মল্ল বর্বক ব্রহ্মোত্তর ভার্গব মার্গব প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুলিন্দ বৈদেহ তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে, ইহারা প্রহসন ভাল-বাসিত, ছোট ছোট নাটক ভাল বাসিত, পূর্ববঙ্গে আশীর্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভালবাসিত, কথোপকথন ভালবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভালবাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ—এ সব ভাল-বাসিত না।

খ্রীস্টের দুই শত বৎসর পূর্বেও যদি বাংলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙালীর কম গৌরবের কথা নয়।

নৌকা ও জাহাজ

বাংলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙালীরা যে অতি প্রাচীন কালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেকরূপ ছিল—দোণা, ডুণি, ডিঙি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা, সকল দেশেই আছে। বাংলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।

বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গদেশে বঙ্গনগরে একজন রাজা ছিলেন, তিনি কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার এক অতি সুশ্রী কন্যা হয়; কিন্তু সে অতি দুষ্ট ছিল। সে একবার পলাইয়া গিয়া মগধযাত্রী এক বণিকের দলে ঢুকিয়া যায়। তাহারা যখন বাংলায় সীমানায় উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বণিকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু রাজকন্যা সিংহের পিছু লইলেন। তিনি সিংহকে সেবায় এতদূর তুষ্ট করিলেন যে, সিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিল। কালক্রমে রাজকন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পুত্রের হাত দুইখানি সিংহের মত হইল, এই জন্য তাহার নাম হইল সিংহবাহু। সিংহবাহু বড় হইলে মা ও ভগিনীকে লইয়া সিংহের গুহা হইতে পলায়ন করিল। বাংলার সীমানায় উপস্থিত হইলে সীমারক্ষক রাজার শালা রাজকন্যা ও তাহার ছেলেমেয়েকে বঙ্গনগরে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে সিংহ গুহায় আসিয়া ছেলেমেয়েদের না পাইয়া বড়ই কাতর হইল। সেও খুঁজিতে খুঁজিতে বাংলার সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে গ্রামেই যায়, গ্রামের লোক ভয় পাইয়া রাজার কাছে দৌড়িয়া গিয়া বলে সিংহ আসিয়াছে। রাজা ঢেঁটরা দিলেন, যে সিংহ মারিয়া দিতে পারিবে তিনি তাহাকে যথেষ্ট বক্‌শিশ দিবেন। কেহই

তাহাতে স্বীকার করিল না। রাজা সিংহবাহুকে বলিলেন, "তুমি যদি সিংহ ধরিয়া দিতে পার, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।" সে সিংহ মারিয়া আনিল ও রাজা হইল এবং আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহার অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল। বড় ছেলের নাম হইল বিজয়। সে বড় দুরন্ত, লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্যক্ত হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, "ছেলেটিকে মারিয়া ফেলো।" রাজা সাত শ অনুচরের সহিত বিজয়কে এক নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয়ের ও তাহার অনুচরবর্গের ছেলেদের জন্য আর এক নৌকা দিলেন ও তাহাদের স্ত্রীদের জন্য আরও একখানা নৌকা দিলেন। ছেলেরা একটা দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নগ্নদ্বীপ; মেয়েরা আর একটি দ্বীপে নামিল, তাহার নাম হইল নারীদ্বীপ। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে, এখন যেখানে বোম্বাই, তাহার নিকটে সুপ্পরাক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল, সংস্কৃতে উহার নাম সুপরার্ক, এখন উহার নাম সুপারা। বিজয় সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ করিল। লোকে তাহাকে তাড়া করিল, সেও আবার নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেল ও লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া নামিল। সে যেদিন লঙ্কাদ্বীপে নামে সেদিন বুদ্ধদেব কুশী নগরে দুই শালগাছের মাঝে শুইয়া নির্বাণ লাভ করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ বিজয় লঙ্কাদ্বীপে নামিল। সে সেখানে আমার ধর্ম প্রচার করিবে, তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।"

সিংহবাহু যে তিনখানি নৌকায় বিজয় ও তাহার লোকজন, উহাদের ছেলেপিলে ও পরিবারবর্গ পাঠাইয়া দেন, সে তিনখানিই খুব বড় নৌকা ছিল। সাত শ লোক যে নৌকায় যায় সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা তৈয়ার হইত। বিজয় যে জাহাজে লঙ্কা যান, সে জাহাজের একখানি ছবি অজন্ত-গুহার মধ্যে

আছে। তাহাতে মাস্তল ছিল, পাল ছিল, স্টীম এঞ্জিন হইবার আগে যেসব জিনিস তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে এসব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটা ত এখনও আছে তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্ততঃ চৌদ্দ শ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এই ভাবে এইরূপ নৌকায় লঙ্কায় নামিয়াছিলেন।

বুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষের অন্যত্র এরূপ অনেক বড় বড় নৌকা ছিল। বোম্বাইএর কাছে ভরুকচ্ছ বা ভড়োচ একটি বড় বন্দর ছিল। সেখান হইতে বড় বড় জাহাজ ববেরু বা বাবিলন যাইত। সুপারা হইতেও জাহাজ যাইত। এক জাহাজে সাত শ লোক যাইবার কথা অনেক জায়গায় শুনা যায়। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বা বাংলা হইতে এরূপ জাহাজ যাইবার কথা বুদ্ধদেবের আগে বা পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া আর শুনা যায় না। তথাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন, বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। অর্থশাস্ত্রে বলে যে, যিনি রাজার 'নাবধ্যক্ষ' থাকিতেন, তিনি 'সমুদ্রসংযানে'রও অধ্যক্ষতা করিতেন। সুতরাং তখনও যে বঙ্গ মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ মগধ হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর বন্দরও নাই।

দশকুমারচরিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, উহা খ্রীস্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খ্রীস্টের জন্মের পূর্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক পোত বঙ্গসাগরে যাইত। দশকুমারের এক কুমার তাম্রলিপ্তি হইতে সেইরূপ এক পোতে চড়িয়া দূর সমুদ্রে যাইতেছিলেন। রামেষু নামে এক যবনের পোত তাঁহার পোতকে ডুবাইয়া দেয়। 'রামেষু নাম্নো যবনস্য' পড়িয়া ইজিপ্টের

রাজা রামেসিসের কথা মনে পড়ে। দশকুমার যখন লেখা হয়, তখনও বোধ হয় রামেসিসের স্মৃতি কিছু কিছু জাগরূক ছিল।

খ্রীস্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চীন যাত্রা করিয়াছিলেন। সে জাহাজে নানা দেশের লোক ছিল। চীন সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড় উঠে, জাহাজ ডুবুডুবু হয়, ফাহিয়ান বুদ্ধদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও ঝড় থামিয়া গেল।

তাহার পরও তাম্রলিপ্তি হইতে চীন ও জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। কিছু দিন পর হইতেই সুমাত্রা জাবা বালি প্রভৃতি দ্বীপে ভারত-বাসীরা যাইয়া বাস করেন এবং তথায় শৈব বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা কলিঙ্গ ও ভরুকচ্ছ হইতেই গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তি হইতেও যাওয়া সম্ভব, কিন্তু এখনও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার লোক যাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় সভ্যতা বিস্তার করে। ডুসেল সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পেগানে বহু পূর্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম প্রচার করিয়াছিল।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাংলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, এ কথা রামচরিতে স্পষ্ট লেখা আছে। ইংরাজী ১২৭৬ সালে তাম্রলিপ্তি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন, এ কথাও কল্যাণী নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।

কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুঁথিতেই আমরা বাংলা দেশের নৌকা-যাত্রার খুব জাঁকালো খবর পাই— চৌদ্দ, পনেরো, ষোলোখানা জাহাজ একজন সদাগর একজন মাঝির অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও চৌদ্দ-পনেরো দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ-উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদসদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন কোন পুঁথিতে লেখে যে, মধুকরের বারো শত দাঁড় ছিল। দ্বিজ বংশী-দাসের মনসার ভাসানে লেখা আছে, সিংহল হইতে তেরোদিন মহাসমুদ্রে যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল, তুলারাশির মত ফেনরাশি নৌকার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। চাঁদসদাগর কাঁদিয়াই আকুল, "আমার যথাসর্বস্ব এই নৌকাগুলিতে আছে, ইহাদের একখানিও দেখিতে পাই না। আমার নিজের প্রাণও যায়।" তিনি মাঝিকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন,—"তুমি ইহার একটা উপায় করো।" মাঝি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, যখন পারিলেন না তখন মধুকর হইতে কতকগুলা তেলের পিপা খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন, ঢেউ থামিয়া গেল; দূরে দূরে সব জাহাজগুলি দেখা গেল। চাঁদসদাগর ত আহ্লাদে আটখানা। এই সকল বই লেখার পরও যখন কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সর্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূরদূরান্তরও যাইতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সহায় ছিল পর্তুগীজ বোম্বেটের দল। ইহার পরেও আবার যখন আরাকানের রাজা ও পর্তুগীজ বোম্বেটেরা বাংলায় বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল, দেশটাকে সত্য সত্যই 'মগের মুল্লুক' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙালী মাঝি দিয়াই সায়েস্তা খাঁ তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গসাগরে বোম্বেটেগিরি থামিয়া গেল।

বৌদ্ধ শীলভদ্র

অভিধর্মকোষ-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণে লেখা আছে যে, গ্রন্থকার বসুবন্ধু দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন। এ কথা যদি ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত এসিয়ার পক্ষে হিউয়ান্ চুয়াং যে দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, হিউয়ান্ চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময় জাপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। হিউয়ান্ চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙালী। ইহা বাঙালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। হিউয়ান্ চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ; বড় বড় রাজা এমন কি সম্রাট হর্ষবর্ধন পর্যন্ত তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন, কিন্তু সে পদের গৌরব, মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। হিউয়ান্ চুয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধশাস্ত্রের ও বৌদ্ধযোগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই,

শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক-এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। এ ত অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষ যাঁহারা বড় বড় মহাযানবিহারের কর্তা ছিলেন, তাঁহাদের থাকাই ত উচিত, কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল—তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময় উহার যে সকল টীকাটিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি হিউয়ান্ চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল। হিউয়ান্ চুয়াং-এর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, "চীন একটি মহাদেশ, হিউয়ান্ চুয়াং ঐখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইহার দ্বারা সদ্ধর্ম্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।" আবার যখন কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মা হিউয়ান্ চুয়াংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, "কামরূপে বৌদ্ধ ধর্ম এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধ ধর্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ।" এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও কিছু এখানে বলা আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল তখন সর্বময় কর্তা। তিনি ধর্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ধর্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধ ধর্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে। বিধর্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সদ্ধর্মের উন্নতি নাই।" শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।" শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন, "এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে?" কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। সে শীলভদ্রের না যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিল, না বচনের উত্তর দিতে পারিল, লজ্জায় অধোবদন হইয়া সে সভা ত্যাগ করিয়া গেল। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি করিব?" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি ত বহুদিন নির্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম কিরূপে রক্ষা হইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।" তখন

শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সংঘারাম নির্মাণ করিয়া দিলেন।

হিউয়ান্ চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা বুদ্ধি ধর্মানুরাগ নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দশ-কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।

৮

বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব

আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধ ধর্মের কয়েকখানি খুব চালিত পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা শান্তিদেব বাঙালী ছিলেন। কিন্তু তারানাথ আমার বিরোধী। তিনি বলেন, শান্তিদেবের বাড়ি সৌরাষ্ট্রে ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি শান্তিদেবের যে অমূল্য জীবনচরিতখানি পাইয়াছি, তাহাতে কে তাঁহার জন্মভূমির নামটি কাটিয়া দিয়াছে— এমন করিয়া কাটিয়াছে যে, পড়িবার জো নাই। কিন্তু তাঁহার লীলাক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা। তিনি যখন বাড়ি হইতে বাহির হন, তাঁহার মা বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি মঞ্জুজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মঞ্জুবজ্রসমাধিকে গুরু করিবে।" সৌরাষ্ট্রে মঞ্জুশ্রীর প্রাদুর্ভাব বড় শোনা যায় না। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাবই বড় কম ছিল।

তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া মনে করিবার আরও একটি কারণ আছে। নালন্দায় তাঁহার একটি 'কুটী' বা কুঁড়ে ঘর ছিল। লোকে দেখিত, তিনি যখন ভোজন করিতে বসিতেন তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন শয়ন করিতেন তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত, যখন কুটীতে বসিয়া থাকিতেন তখনও তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকিত ; সেইজন্য—

ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ
সুপ্তোপি প্রভাস্বরঃ
কুটীং গতোপি প্রভাস্বরঃ।

এই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল 'ভূসুকু'। তিনি যখন মগধের রাজধানীতে থাকিতেন, তখন তিনি রাউতের কার্য করিতেন। এমন কতগুলি বাংলা গান আছে, যাহার ভণিতায় লেখা আছে 'রাউতু ভণই কট, ভূসুকু ভণই কট।' এখন এই রাউতু, ভূসুকু ও শান্তিদেব একই ব্যক্তি কিনা, ইহা ভাবিবার কথা। তিনজনই এক, ইহাই অধিক সম্ভব।

আরও এক কথা, শান্তিদেব তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন—(১) সূত্র-সমুচ্চয়, (২) শিক্ষাসমুচ্চয় ও (৩) বোধিচর্যাবতার। শেষ দুইখানি পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইয়াছে। প্রথমখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভূসুকুর নামে আমরা একখানি বই পাইয়াছি, সেখানি ভূসুকুর লেখা। উপরের দুইখানির মত এইখানিও সংস্কৃতে লেখা, তবে মাঝে মাঝে বাঙ্গলা আছে। উপরের দুইখানির মধ্যেও আবার শিক্ষাসমুচ্চয়ে অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর এক ভাষায় লেখা। এখন আপত্তি উঠিতে পারে যে, শান্তিদেবের যে দুইখানি পুস্তক ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইখানিই মহাযানের বই; শেষে যেখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি হয় বজ্রযানের, নাহয় সহজযানের। এক লোক কি দুই যানের পুস্তক লিখে? এ সম্বন্ধে বেন্‌ডল সাহেব বলেন যে, শিক্ষা-সমুচ্চয়েও তান্ত্রিক ধর্মের অনেক কথা পাওয়া যায়। আমরাও দেখিয়াছি যে, বজ্রযান সহজযান ও কালচক্রযান মহাযান-ছাড়া নয়। এই সকল যানের লোকেরা মনে করিত যে, "আমরা মহাযানেরই লোক, কেবল আমরা মহাযানকে সহজ করিয়া তুলিয়াছি ও উহার অনেক উন্নতি করিয়াছি।" এখনও নেপালী বৌদ্ধেরা বলে, "আমরা মহাযান বৌদ্ধ।" কিন্তু তাহারা বাস্তবিক বজ্রযান বা সহজযানের উপাসক।

বোধিচর্য্যাবতারে শান্তিদেব বার বার বিপক্ষদের একটি কথা বলিয়া গালি দিয়াছেন। সে গালিটি কিন্তু বাংলা ছাড়া আর কোথাও শুনি নাই ; সে কথাটি 'গূথ-ভক্ষক'। আমাদের দেশে দিনরাত্রি এই গালিটি শুনা যায়।

আরও কথা, একটি ভুসুকুর গানে আছে,—

আজ ভুসুকু তু ভেলি বাঙ্গালী।
নিজ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥

আজ ভুসুকু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী হইয়াছিস ইত্যাদি।

এই সকল কারণে আমি শান্তিদেবকে আমাদের অষ্টম গৌরব মনে করি। তেঙ্গুর গ্রন্থে লেখা আছে, শান্তিদেবের বাড়ি জাহোর। জাহোর কোথায় জানি না, তবে উহার সন্ধান হওয়া আবশ্যক।

৯

নাথপন্থ

আমাদের দেশে এখন যে সব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি নাথ। তাঁহারা বলেন, "আমরা এ দেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।" তাই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার-ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত নয়। এই জাতি কোথা হইতে আসিল, অনেক বৎসর ধরিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের পুরাণ-পর্যায়ে ষোড়শ খণ্ডে হজ্‌সন সাহেবের মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার প্রথম ধারণা হয় যে, নাথপন্থ নামে এক প্রবল ধর্মসম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাংলায় এবং পূর্ব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। পূর্বে সকলেরই ধারণা ছিল যে, গোরক্ষনাথের 'হঠযোগপ্রদীপিকা'য় যে চৌদ্দজন নাথের নাম করা আছে, তাঁহারা সকলেই কবীরের সময়ের লোক। কবীরের সঙ্গে গোরক্ষনাথের কথাবার্তা লইয়া কবীরপন্থীদিগের একখানি বই আছে, সুতরাং গোরক্ষনাথ ও কবীর এক কালের লোক। কিন্তু বাসিলীফ তিব্বতীয়-গ্রন্থমালা হইতে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ খৃস্টের আট শ বছর পরের লোক। নেপালে বৌদ্ধদিগের সংস্কার যে, সব নাথেরাই বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়িয়া শৈব হন। বৌদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল রমণবজ্র কি অনঙ্গবজ্র। ক্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' নামে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছন্দপাদের 'অবতারিত' একখানি তন্ত্র পাইলাম। উহা যে অক্ষরে

লেখা, সে অক্ষর খ্রীস্টের নয় শত বৎসরের পর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের নামগন্ধও নাই। একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে মীননাথের একটি বাংলা পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে, ইহা পরদর্শনের মত। আরও অনেক কারণ আছে, যাহাতে বেশ বোধ হয় যে নাথেরা না-হিন্দু না-বৌদ্ধ এমন একটি ধর্মমত প্রচার করেন।

শিব তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদের বইগুলি হরপার্বতী-সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা। তাঁহারাই সেইগুলি কৈলাস হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তাঁহারাই হঠযোগ প্রচার করেন। নানারূপ আসন করিয়া যোগ করা তাঁহাদের ধর্ম। তাঁহাদের ধর্মের মূল কথাগুলি এখনও পাওয়া যায় নাই। যা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহারা লোককে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদের ধর্মে স্বর্গ-অপবর্গের দিকে তত ঝোঁক ছিল না। তাঁহাদের চেষ্টা সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি পরিণামে ভেল্কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূল নাথেরা কি করিতেন, জানা যায় না; কিন্তু এখন অনেক নাথেরা ভেল্কি দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রিয়সেবায় নাথেদের কোন আপত্তি নাই। এখন যোধপুরের মহামন্দির নাথেদের একটি প্রধান স্থান। নাথজি খুব বড় মানুষ। তাঁহার মহামন্দির একটি প্রকাণ্ড সহর, চারিদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা। নাথজির মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, নাথজিরা পূর্ব পূর্ব নাথেদের পদচিহ্ন পূজা করেন। লোকে নাথজিদের দেবতা বলিয়া মনে করে। তাঁহারা বিবাহ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইবার কোন আপত্তি নাই, মদ্যমাংসেও তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। নাথজির এক ভাঁটি মদ নামিতে দশ হাজার টাকা খরচ হয়।

নাথেরা যে বাংলা দেশের বা পূর্ব-ভারতের লোক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ— মীননাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি খাঁটি বাংলা। গোরক্ষ-

নাথের লীলাক্ষেত্র বাংলাতেই অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা আমাদের ময়নামতীর গানের নায়ক। মীননাথ যখন তাঁহার নিজের ধর্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন গোরক্ষনাথই তখন তাঁহাকে সে কথা মনে করাইয়া দেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেক সময় মচ্ছন্দনাথ বলে, অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার বাংলা দেশের লোক হওয়াই সম্ভব।

ক্রমে নাথপন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথেদের উপাসনা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের নামগন্ধ না থাকিলেও, তিনিই এখন নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা। তাঁহার রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধুমধাম হইয়া থাকে, এমন আর কোন দেবতার কোন যাত্রায় হয় না। গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে খুশী না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধেরা এখনও তাঁহার পূজা করে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়।

১০

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

বাংলা দেশের দশম গৌরব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁহার নিবাস পূর্ববঙ্গে বিক্রমণীপুর। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীল বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন। সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে স্থবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি স্থবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অনেক বড় বড় লোক, অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখাপড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশীল-বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রীভিক্ষু প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল।

এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্য যানাবলম্বীদিগের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন ও তাহাতে জয়লাভ করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বনপার দল খুব প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতে ভয় পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীল-বিহার হইতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর দুই-একবার যাইতে অসম্মত হইলেও,

বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিণামে তথায় যাইতে স্বীকার করেন। তিনি যাইতে স্বীকার করিলে, তিব্বতরাজ অনেক লোকজন দিয়া তাঁহাকে সসম্মানে আপন দেশে লইয়া যান। যাইবার সময় তিনি কয়েকদিন নেপালে স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে বাস করেন। তথা হইতে বরফের পাহাড় পার হইয়া তিনি তিব্বতের সীমানায় উপস্থিত হন। যিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী পশ্চিম-তিব্বতে ছিল। যে সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন, সে সকল বিহার এখনও লোকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। ফ্রাঙ্কে সাহেব যে আর্কিয়লজিকাল রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার কর্মক্ষেত্র সকল বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অতিশা যখন তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর। এরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখনও বৌদ্ধ ধর্মের লোপ হইবে, এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযানধর্মের অধিকারী নয়; কেন না, তখনও তাহারা দৈত্যদানবের পূজা করিত; তাই তিনি অনেক বজ্রযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তেঙ্গুর ক্যাটালগে প্রতি পাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা— এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই।

জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র

রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি পুঁথি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন। তাহার মধ্যে শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয় নামে একখানি পুঁথি থাকে। পুঁথিখানি কাগজের, হাতের লেখা, অধিকাংশই বাংলা। বেনডল সাহেব যখন এই পুঁথিগুলির ক্যাটালগ করেন তখন তিনি বলেন যে, এ পুঁথিখানি খ্রীস্টের জন্মের চৌদ্দ শ বা পনেরো শ বছর পরে লেখা। তাহার পর তিনি যখন উহা ছাপান, তখন তিনি ভূমিকায় লিখেন, "না, আর এক শ বছর আগাইয়া যাইতে পারে, কাগজ কি এর চেয়েও পুরানো হবে?" বেন্ডল সাহেব একজন বড় লোক। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব ছিল; তিনি ও আমি দুই জনে একবার নেপাল [illegible]। তথাপি এ জায়গায় আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। আমি নেপালে এর চেয়েও পুরানো কাগজের পুঁথি দেখিয়াছি এবং দুই-একখানি আনাইয়াছি। সুতরাং কাগজ বলিয়া যদি পুঁথিখানি নূতন হয়, তাহা হইলে আমি তাহাতে রাজী নই। ডাঃ হার্নলি সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে, অনেক পূর্বে নেপালে 'কায়গদ' ছিল। 'কায়গদ' শব্দটি চীনের। আমরা কাগজ পরে পাইয়াছি, কেননা আমরা উহা সরাসর চীন হইতে পাই নাই, মুসলমানদের হাত হইতে পাইয়াছি, মুসলমানেরা চীন হইতেই পাইয়াছিল। মুসলমানেরা কায়গদ শব্দটিকে কাগজ করিয়া তুলিয়াছে।

পুঁথিখানির শেষে লেখা আছে—দেয় ধর্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জাগদ্দলপণ্ডিত বিভূতিচন্দ্রস্য ইত্যাদি।

বেন্ডল সাহেব বলিয়াছেন, "মহাযানপন্থী জগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র কে আমি জানি না।" ১৯০৭ সালে আমি আবার নেপালে গিয়া কয়েকখানি পুঁথিতে জগদ্দল-মহাবিহারের নাম পাই; কিন্তু আমিও তখন সে মহাবিহার কোথায়, কি বৃত্তান্ত, জানিতাম না। সেই বারে আমি বিভূতিচন্দ্রেরও নাম পাই। তিনি 'অমৃতকর্ণিকা' নামে 'নামসংগীতি'র একখানি টীকা করেন, ঐ টীকা কালচক্রযানের মতে লিখিত হয়।

তাহার পর রামচরিত কাব্য ছাপাইবার সময় জানিতে পারি, রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান 'জগদ্দল মহাবিহার' তাহারই কাছে ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সংগমের উপরেই ছিল। এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না, পড়ে যমুনায়; গঙ্গাও এক সময় বুড়িগঙ্গা দিয়া যাইত। তাই ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক পুরানো গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে কোথাও হইবে। আমি এ কথা প্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদ্দল খুঁজিতেছেন, কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায়; কিন্তু খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্ক-বিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদত্তম বিহার, সেইরূপ বাংলার মহাবিহার জগদ্দল। তাঞ্জুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোন কোন জায়গায় লেখে বাংলায়, কোন কোন জায়গায় লেখে পূর্ব-ভারতে।

যাহা হউক, উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রামপালই যে ঐ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। এই বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতি-চন্দ্রই প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। যখন তিব্বত দেশে এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জমায় সাহায্য করিয়াছেন

চৌরাশি সিদ্ধের নাম করিতে গিয়া ছিয়াত্তর জনের নামমাত্র করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে লুইএর অনেকগুলি শিষ্যের নাম আছে। হরিসিংহের সময় পর্যন্ত লুইএর দল যে চলিয়া আসিতেছিল, ইহাতেই বোধ হয় যে, লুই একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন।

তাঞ্জুরে লেখা আছে যে, লুইকে মৎস্যান্ত্রাদ বলিত, অর্থাৎ তিনি মাছের পোঁটা খাইতে বড়ই ভালবাসিতেন। (কোন্ বাঙালীই বা না বাসেন!) তাঞ্জুরে আবার সেইখানেই লেখা আছে, "তাই বলিয়া লুই মৎস্যেন্দ্রনাথ নহেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের পুত্র, লুই মহাযোগীশ্বর।"

সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুড়রী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্নু, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আযদেব, ঢেণ্ঢন, দারিক, ভাদে, তাডক— এই কয়জনের 'চর্যাপদ' বা কীর্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পদ মুসলমান-বিজয়ের পূর্বেই দুর্বোধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিয়ামতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। ঐ সকল দোহাকোষেরও সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, তাহারও সংস্কৃত টীকা ছিল। এই সমস্তেরই ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা আছে। যে কয়জন সিদ্ধাচার্যের নাম করিলাম, ইহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই ভুটিয়া ভাষায় তর্জমা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভুটিয়া ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তাঞ্জুর গ্রন্থ খুঁজিলে যে শুধু বাঙালীদের ধর্মমত পাওয়া যাইবে এমন নয়, বাংলা সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইবে। বাঙালীর পূর্বপুরুষের কথা বাঙালী কিছুই জানেন না, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ভুটিয়ারা বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রক্ষা করিতেছে। এটা বাঙালীর কলঙ্কের কথা হইলেও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের বিশেষ গৌরব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৩

ভাস্করের কাজ

বাংলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর্য-শিল্প। মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও যতই তন্ত্রের মত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোধিসত্ত্ব-পূজা আরম্ভ হইল। এক এক দেবতারই নানা মূর্তি হইতে লাগিল। কখনও ক্রোধমূর্তি, কখনও শান্তমূর্তি, কখনও করুণামূর্তি—নানারূপ মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মুদ্রার, সে সকল মূর্তির ও সে সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় ২৫৬ রূপ মূর্তির সাধনের কথা বলা আছে। তাঞ্জুরে ১৭৯ বাণ্ডিলে প্রায় ১৬৬ দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই সকল দেখিয়া মূর্তি আঁকিতে পারে। বাংলায় এরূপ আঁকিয়া দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাহারা মোমের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাহারা কত রকম মূর্তি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মূর্তিবিদ্যার ইংরাজী নাম আইকনোগ্রাফি Iconography। সেদিন একজন প্রসিদ্ধ আইকনোগ্রাফিস্ট এক সভায় বলিয়াছেন যে, মূর্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাংলা। বাস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্তিই যে ছিল, আর কত মূর্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র-রিসার্চ-সোসাইটি অনেক মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষদেও অনেক মূর্তি সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউজিয়মেই কিছু কিছু মূর্তিসংগ্রহ আছে; তথাপি

বনে জঙ্গলে পুরানো গ্রামে পুরানো নগরে এখনও গাড়ি গাড়ি মূর্তি পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল মূর্তির এখন আর পূজা হয় না। সুতরাং মিউজিয়মই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। যে সকল মূর্তির এখনও পূজা হয় তাহাই বা কত সুন্দর! এক-একটি কৃষ্ণমূর্তির ভাব দেখিলে সত্য সত্যই মোহিত হইতে হয়। এখনও ভাস্করেরা নানারূপ সুন্দর সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করিয়া থাকে। দাঁইহাটের ভাস্করদের কথা ত সকলেই জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্তি নির্মাণ হইত। পালরাজাদের সময়েই এই ভাস্করশিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এখানকার ভাস্করেরা কার্য করিত। তাম্রপত্রলেখ, শিলালেখ বারেন্দ্র কায়স্থদিগের যেন একচেটিয়াই হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও মূর্তিনির্মাণ হইত। মহিসুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশেও নানারূপ মূর্তি পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে সাজসজ্জাই বেশী, গহনা, ফুল, সাজ— ইহাতেই পরিপূর্ণ, ভাব দেখাইবার চেষ্টা খুব কম। যে ভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে সে ভাব কেবল বাংলাতেই ছিল, কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় মূর্তি দেখিলে মনে হয় যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয়, যেন উহা এই নৃত্য করিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ বাঁশি হাতে দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা যেন সে বাঁশির আওয়াজ শুনিতেছি। শিল্পের এত উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়। বাঙালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে তামায় রূপায় সোনায় অষ্টধাতুতে, যাহাতেই বল, মূর্তিগুলি যেন সজীব।

চৈতন্যদেবের পর গরিব বৈষ্ণবেরা কাঠের ও মাটির মূর্তি তৈয়ার করিত। মহাপ্রভুর দুই-একটি কাঠের মূর্তি দেখিলে সত্যসত্যই মনে হয়, মহাপ্রভু কথা কহিতেছেন. ঠোঁটদুটি যেন নড়িতেছে। চৈতন্যের

কীর্তনমূর্তি অনেকেই দেখিয়াছেন, কি সুন্দর! মাটির মূর্তিতে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এখনও বোধহয় ভারতে অদ্বিতীয়। একজন ইউরোপের ওস্তাদ কতকগুলি মাটির গড়া মানুষের মূর্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহারা সত্যসত্যই অনেকদিন ধরিয়া মানুষের শিরা-ধমনী পর্যন্ত তলাইয়া দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে।"

১৪

বাংলায় সংস্কৃত

মুসলমান-আক্রমণের পূর্বে বাংলায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ভবদেব একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে যাহা কিছু পড়িবার ছিল, তিনি যেন সবই পড়িয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার প্রশস্তি লিখিয়াছেন। সেই প্রশস্তিতে যাহা লেখা আছে তাহা যদি চারিভাগের একভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভবদেব যে দেশে জন্মিয়াছিলেন সে দেশ ধন্য। তাঁহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে সামবেদীদের পদ্ধতি ছাড়া আরও তাঁহার দশ-বারোখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

লোকে বলে বাংলায় বেদের চর্চা ছিল না, এ কথা সত্য। অন্য জায়গায় যেমন সমস্ত বেদটা মুখস্থ করে, বাঙালীরা তাহা করিত না, তাহারা তত আহম্মুক ছিল না। তাহারা যেটুকু পড়িত অর্থ করিয়া পড়িত; নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য যতখানি জানা দরকার সবটুকু বেশ ভাল করিয়া পড়িত। সুতরাং প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাংলাতেই হয়। সায়ণাচার্যের দুই-তিন শত বৎসর পূর্বে গুগড়াচার্য এক নূতন ধরনের বেদব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। গুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের পুস্তক অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হলায়ুধ তাঁহার সম্প্রদায়ের, গুণবিষ্ণু তাঁহার সম্প্রদায়ের। ইহাদের ব্যাখ্যা বেশ পরিষ্কার ও বেশ সুগম।

দর্শনশাস্ত্রে বৌদ্ধদের সঙ্গে সর্বদাই তাঁহাদের বিচার করিতে হইত। সুতরাং বাঙালী ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দর্শনশাস্ত্রের কিছু চর্চা রাখিতে হইত। শ্রীধরের লেখা প্রশস্তপাদের টীকা এখন ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত।

স্মৃতিতে গৌড়ীয় মতই একটা স্বতন্ত্র ছিল। কাশী মিথিলা ও নেপাল দেশের প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধে অনেকবার গৌড়ীয় মতের নাম করিয়াছে। মনুর টীকাকার গোবিন্দরাজ যে স্মৃতিমঞ্জরী বলিয়া এক প্রকাণ্ড স্মৃতিনিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য হইতে হয়। আমরা উঁহার যে পুঁথিখানি পাইয়াছি, তাহা খ্রীস্টীয় ১১৪৫ সালে কাপি করা। দায়ভাগকার জীমূতবাহন, জিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক স্মৃতিনিবন্ধকারের ও জোগ্নোক, অন্ধুক ভট্ট প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ-নিবন্ধকারের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা করিয়া তুলিয়াছেন সেই ত একটি অদ্ভুত জিনিস। সম্পত্তি পূর্বে বংশগত ছিল, তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত করিয়া গিয়াছেন, এ কাজটি ত ভারতে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বল্লালও ত নিজে দুখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, একখানি দানসাগর ও আর-একখানি অদ্ভুতসাগর। শ্রীনিবাসাচার্যের শুদ্ধির গ্রন্থও ত স্মৃতি ও জ্যোতিষের একখানি ভাল বই।

১৫

বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন

ধর্মের গৌরব, বিদ্যার গৌরব ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ বাংলা দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। বৌদ্ধেরা তিব্বতে গিয়া সেখানে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণেরাও বাংলায় নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতেছিলেন। এমন সময় ঘোর বন্যার ন্যায় আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বন্যায় রাজা-প্রজা, বৌদ্ধ-হিন্দু, বজ্রযান-সহজযান, ন্যায়-স্মৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান— সব ভাঙিয়া, ভাসিয়া গেল। বাঙালী ও বেহারী শিল্পের ভাল ভাল জিনিসগুলি, বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় মন্দির, দেবমূর্তি, মনুষ্যমূর্তি, ক্রোধমূর্তি, শান্তমূর্তি, হিন্দুমূর্তি বৌদ্ধমূর্তি, তালপাতের পুঁথি, ভূর্জপত্রের পুঁথি, ছালের পুঁথি, তেড়েতের পুঁথি, নানারূপ চিত্র, নানারূপ কারুকার্য, সব নাশ হইয়া গেল। ওদন্তপুরে মুসলমানেরা সিপাই বলিয়া হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মারিয়া ফেলিল, কেল্লা বলিয়া মহাবিহারটিকে সমভূম করিয়া দিল, বৌদ্ধমূর্তি ও যাত্রার সাজসজ্জা সব লুটিয়া লইয়া গেল, সোনারুপার মূর্তিগুলি গলাইয়া ফেলিল, পুঁথিগুলি পুড়াইয়া ফেলিল। প্রতি বিহারেই এইরূপ হইতে লাগিল। ওদন্তপুরের বিহার এখনও চেনা যায়, সে জায়গাটা এখনও তিরিশ ফুট উঁচু; নালন্দার নাম পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে, পাশের একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের নামে তাহার নাম হইয়াছে 'বড়গাঁয়ের ঢিবি'; বিক্রমশীলার সন্ধানও পাওয়া যায় নাই; জগদ্দল খুঁজিয়া মিলিতেছে না; বিদেশীরা এমনি করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে, তাহাদের স্মৃতি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। ভাগ্যে নেপাল ছিল,

তিব্বত ছিল, তাই এত দিনের পর তাহাদের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। এবং ইংরাজ-আমলে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আমরা আমাদের পূর্বগৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছি।

পুষ্যমিত্রের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডেও যে ধর্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, কুমারিল-শঙ্করের প্রাণপণ চেষ্টাতেও যে ধর্ম পূর্বভারতে অক্ষুণ্ণ ছিল, ব্রাহ্মণদের নিরন্তর বিদ্বেষসত্ত্বেও যে ধর্ম চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, এক তুর্কী-আক্রমণেই সে ধর্ম শুধু যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গোলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব-উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি হইল, ধর্ম বৃদ্ধি হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শিল্প বৃদ্ধি হইল; ক্ষতি যাহা হইবার তাহা বাংলারই হইয়া গেল।

দুই শত বৎসর পর্যন্ত বাঙালীরা প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস করিতে লাগিল। এই সময় দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল, কুলগ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দুই শত বৎসর নিরন্তর মারামারি কাটাকাটির পর একবার একজন হিন্দু বাংলার রাজা হইয়াছিলেন। অমনি আবার হিন্দুসমাজে সংস্কৃতসাহিত্য বাংলাসাহিত্য জাগিয়া উঠিল। যে মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ, একান্ত যত্ন ও দূরদর্শিতার ফলে সংস্কৃতসাহিত্য আবার বাঁচিয়া উঠে তাঁহার নাম বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুকুট। তিনি নিজে অনেক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া, একখানি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোষের টীকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিয়া আবার সংস্কৃতসাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকর। ইনিও বৃহস্পতির ন্যায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন

এবং দুইজনে মিলিয়া অমরকোষের আর-একখানি টীকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র শ্রীনাথ পূরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আবার হিন্দুসমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তিনি বিশেষরূপ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহার বাঁধা সমাজ এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইঁহারা আমাদের পূজ্য, নমস্য এবং গৌরবের স্থল।

ন্যায়শাস্ত্র

তুর্কী-আক্রমণে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়, দর্শনশাস্ত্রও লোপ হইয়াছিল। রাজা গণেশের পর হইতে যে আবার সংস্কৃতচর্চা আরম্ভ হইল, তাহার ফলে ন্যায়ের চর্চা আরম্ভ হইল। এই চারিশত বৎসরের মধ্যে বাংলার ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, যিনি নৈয়ায়িক তিনি কিছু না কিছু বাংলা কথা কহিতে পারেন। নবদ্বীপে না আসিলে তাঁহাদের চলে না। সুতরাং তাঁহাদের নবদ্বীপে আসিতেও হয়, বাংলা ভাষা শিখিতেও হয়। দেশে গিয়া যদিও বাংলা ভুলিয়া যান, তথাপি বাঙালী দেখিলেই আবার তাঁহাদের দুটা বাংলা কথা কহিবার ইচ্ছা হয়। কাশ্মীর যাও, পঞ্জাব যাও, নেপাল যাও, হিন্দুস্থান যাও, রাজপুতানা যাও, মাদ্রাজ যাও, মহিসুর যাও, ত্রিবাঙ্কুর যাও, নৈয়ায়িকের মুখে দুচারিটি বাংলা কথা শুনিতেই পাইবে। বাঙালীর এটা বড় কম গৌরবের কথা নয়। ভারতে বাঙালীর এই প্রাধান্য যাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য ও নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম, বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি কিন্তু কোন গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই বা তাঁহার কোন গ্রন্থ চলিত হয় নাই। দ্বিতীয়, রঘুনাথ শিরোমণি। ইঁহার বুদ্ধি ক্ষুরের ধারের মত সূক্ষ্ম ছিল। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার তত্ত্বচিন্তা-মণির টীকাই লোকে বেশী জানে। তিনি যে শুধু বাসুদেব সার্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্রের নিকট পড়িয়াছিলেন এমন নহে— তিনি মহারাষ্ট্র-দেশে যাইয়া রামেশ্বরের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র যে শুধু

বাংলা দেশেই ছিল এমন নহে— দ্বারবঙ্গের রাজার পূর্বপুরুষ মহেশ পণ্ডিতও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। শিরোমণির পর আমাদের দেশের লোক হরিরাম, জগদীশ ও গদাধরকেই চিনে ও ইহাদের টীকাটিপ্পনী পাঠ করে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে এককালে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বড়ই আদর হইয়াছিল। মহাদেব পুন্তামকর ভবানন্দের টীকারই টীকা লিখিয়াছেন ও সেই টীকা এখনও দুই-চারি জায়গায় চলে। ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ। তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত দুরূহ সিদ্ধান্তের যেরূপ সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্চর্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্বত্রই তাঁহার কারিকা ও তাঁহার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী চলিতেছে। বাংলায় তাঁহার টীকাকার কেহ জন্মে নাই; তাঁহার টীকাকার একজন মারহাট্টী, তাঁহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, এই নৈয়ায়িকগণই এখনও ভারতে বাংলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ বাংলার স্মার্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাংলার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।

চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর

বৌদ্ধ মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল—বিলুপ্তই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ ধর্মের কি দশা হইল? পাদরি না থাকিলে খ্রীস্টানদের যে দশা হয়, ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দুদের যে দশা হয়, মৌলবি না থাকিলে মুসলমানদের যে দশা হয়, বৌদ্ধ ধর্মের ঠিক সেই দশা হইল। বাহির হইতে কেহ উহা আক্রমণ করিলে রক্ষা করিবার লোক রহিল না। ভিতরে গোলযোগ হইলে, তাহার সংস্কার করিবার লোক রহিল না। রহিল কেবল মূর্খ পুরোহিতকুল আর অসংখ্য কৃষক বণিক ও কারিকর। মুসলমানেরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে বড় বড় বিহার ছিল, অনেক নিষ্কর জমি বিহারওয়ালারা ভোগ করিত। বিজেতারা সে সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া আফগান সিপাহীদিগকে ভাগ করিয়া দিল। ওদন্তপুর ও নালন্দার জমী লইয়া মল্লিক নামে এক মুসলমান-কুলেরই উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলার বিহারের খবর জানি না, তবে একটা খবর জানি বলিয়া বোধ হয়। বালান্ডা পরগনায় খুব ভাল মাদুর হয়, তখনও হইত, এখনও হয়। সেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, অনেক ভিক্ষু ছিল, পুঁথি নকল হইত, ঠাকুর-দেবতার পূজা হইত। বালান্ডার একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' এখনও নেপাল-দরবার-লাইব্রেরীতে আছে, বালান্ডার বৌদ্ধ কীর্তির এইমাত্র স্মৃতি জাগরূক আছে। এখন সেই বালান্ডায় সব মুসলমান। মুসলমানেই মাদুর বুনে, মাদুর বুনিবার জন্য এক

ঘরও হিন্দু নাই। বিহারগুলি এইরূপে শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুসলমান আসিয়া বসিল এবং তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আজ বাংলায় অর্ধেকের উপর মুসলমান।

বাকি যাহারা ছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু করিল কে? ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ত এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক দলের নেতা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। আর এক দলের নেতা গৌড়ীয় শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগমবাগীশ। এক দল বৈষ্ণব, আর-এক দল শাক্ত।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বাঙালী ছিলেন, তাঁহার পরিকরও প্রায় সবই বাঙালী। ইঁহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বাংলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, কবিকর্ণপুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া উপেন্দ্র গোস্বামী পর্যন্ত কত লোক যে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বাংলার ত কথাই নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনন্দন গোস্বামী পর্যন্ত কত কত বৈষ্ণব লেখক বাংলায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাংলা ভাষাকে মার্জিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নূতন জীবন দিয়া গিয়াছেন। বাংলায় বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্তি— কীর্তনের পদ। বৌদ্ধদিগের চর্যাপদের অনুকরণে এই সকল পদাবলীর সৃষ্টি। পদাবলীর পদকর্তা অসংখ্য। রাধামোহন দাস ৮০০।৮৫০ পদ সংগ্রহ করিয়া

গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস ৩৩০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০,০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। ভাবের মাধুর্যে, ভাষার লালিত্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সকল গান সকল সমাজেরই পরম আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার জন্য নানারূপ কীর্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালে যেমন বাংলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র 'প্রবৃত্তি' ছিল, এখনও কীর্তনের সেইরূপ নানা 'প্রবৃত্তি' হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান— মনোহরশাহী ও রেনেটি। ভক্তিরত্নাকরে লেখা আছে যে, শ্রীখণ্ডে যখন প্রথম কীর্তন হয়, তখন স্বর্গ হইতে চৈতন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখনও বোধ হয় ভাল কীর্তন জমিলে সেখানে চৈতন্য সপরিকর আবির্ভূত হন। বাংলার কীর্তন একটা সত্যসত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার জন্য চৈতন্যদেবের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সম্পূর্ণরূপে ঋণী।

১৮

তান্ত্রিকগণ

তন্ত্র বলিলে কি বুঝায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। বৌদ্ধেরা বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান— সকলকেই তন্ত্র বলে। কাশ্মীরী শৈবদের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। নাথ-পন্থের সকল গ্রন্থই তন্ত্র। অন্যান্য শৈব সম্প্রদায়ের গ্রন্থও তন্ত্র। আবার শাক্তদের সব গ্রন্থও তন্ত্র। এখন আবার বৈষ্ণবদের পঞ্চরাত্রগুলিকেও তন্ত্র বলিতেছে। বাস্তবিকই বৈষ্ণবদের কয়েকখানি তন্ত্র আছে। এরূপ অবস্থায় তন্ত্র বলিলে হয় সব বুঝায়, নাহয় কিছুই বুঝায় না।

অনেক তন্ত্রে বলে, বেদে কিছু হয় না বলিয়াই আমাদের উৎপত্তি। আবার অনেকে বলেন, অথর্ববেদই তন্ত্রের মূল। মূলতন্ত্রগুলি হয় বুদ্ধদেবের মুখ হইতে উঠিয়াছে, নাহয় হরপার্বতীসংবাদ রূপে উঠিয়াছে। যেগুলি হরপার্বতীসংবাদ সেগুলি কেহ-না-কেহ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে 'অবতারিত' করিয়াছেন, না হইলে লোকে তাহা জানিবে কিরূপে? একজন বৌদ্ধ তন্ত্রকার বলিয়াছেন, "আমরা ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নহি। আমরা সোজা-কথায় লিখি। যে ভাষা সকলে বুঝিতে পারিবে আমরা এমন ভাষায় লিখি।" মূল তন্ত্রে ব্যাকরণের বড় ধার ধারে না। কিন্তু মূল তন্ত্র বড় একটা পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত দুই-চারিখানি মূল-তন্ত্র ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিজের একখানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাঁহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে।

বাংলার এই সকল সংগ্রহকর্তাদের প্রথম ও প্রধান— গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য। তাঁহার অনেকগুলি সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার স্তবগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি নানা ছন্দে নানা স্তব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ বড় শঙ্করাচার্যের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বড় শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি তন্ত্র লিখিতে যাইবেন কেন? তন্ত্রের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া একটু নূতন। উহা ব্রাহ্মণদের কোন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সহিত মিলে না। কিন্তু এখন বাংলার লোকে ঐরূপ সৃষ্টিপ্রক্রিয়াই জানে। সংগ্রহকারেরা মূলতন্ত্র অনেক পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। মূলতন্ত্রে অনেক প্রক্রিয়া আছে যাহা সভ্যসমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহকারেরা উহা মার্জিত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মার্জিত করিয়া লইলেও তাঁহাদের গুহ্য উপাসনা বড় সুবিধার নয়। আমার বিশ্বাস তন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা যত কম হয়, ততই ভাল। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষেরা এই লোকায়ত তন্ত্রশাস্ত্রকে মার্জিত করিয়া সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ করায় অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা যে খুব দূরদর্শী ও সমাজনীতিকুশল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক শঙ্করের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দের পুস্তকে অক্ষোভ্য, বৈরোচন প্রভৃতি বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। অক্ষোভ্য এখানে ঋষি হইয়াছেন, বৈরোচন দেবতা হইয়াছেন। যে তারামন্ত্র সাধনের জন্য বশিষ্ঠদেবকে চীনে যাইয়া বুদ্ধদেবের শরণ লইতে হইয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ সেই তারার পূজারই রহস্য লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে তারা অক্ষোভ্যেরই শক্তি। বৌদ্ধ মতে তারা, একজটা, নীলসরস্বতীর উপাসনা

আছে, তারারহস্তেও তাই। বৌদ্ধেরা শূন্যবাদী, তারারহস্তেও শূন্যের উপর শূন্য, তাহার উপর শূন্য, এইরূপে ষষ্ঠ শূন্য পর্যন্ত উঠিয়াছে। বৌদ্ধ-মতে এই সকল দেবীর ধারণী আছে, সাধন আছে; তারারহস্তে তাঁহাদের গায়ত্রী আছে। বোধ হয় ঐ অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, এই উপায়েই ব্রহ্মানন্দ তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ একজন খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সংগ্রহগুলি আরও মার্জিত। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তিনি বেশ সংস্কৃত লিখিতে পারিতেন। পূর্ববঙ্গে ও বরেন্দ্রে তাঁহার বংশধরেরাই গুরুগিরি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শিষ্যশাখা অসংখ্য।

রাঢ়ে আগমবাগীশের সংগ্রহ আরও মার্জিত। তাঁহার গ্রন্থে পঞ্চ-মকারের কথা নাই বলিলেই হয়, তাই এ দেশে তাঁহার বড়ই আদর। কিন্তু তাঁহারও গ্রন্থে মঞ্জুঘোষের উপাসনার ব্যাপার আছে। মঞ্জুঘোষ যে একজন বোধিসত্ত্ব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তান্ত্রিক সংগ্রহকারেরা হতাবশিষ্ট বৌদ্ধগণকে নানা উপায়ে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বাংলা সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তান্ত্রিক মহাশয়েরা বঙ্গসমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষার সাহিত্য তাহার সাক্ষী। তাঁহাদের দলে বাংলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ ভাল। তাঁহাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলি বাংলার একটি শ্লাঘার বিষয়। আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙালী কি কেহ আছে? দেওয়ানজি মহাশয়ের ও কমলাকান্তের গান অনেক সময় হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয়।

বাঙালী হিন্দুর মধ্যে একেবারে বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অপেক্ষা স্মার্ত পঞ্চোপাসকের দলই অধিক। ইহারা যদিও শাক্তসম্প্রদায়ভুক্ত নন, কিন্তু বাঙালীরা জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব নাহয় শাক্ত হইতে হইবে। সেইজন্য যাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহারা সকলেই শাক্ত, শাক্তসম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাক্ত। এই দলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা শ্যামাবিষয়ক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে।

১৯

বাঙালী ব্রাহ্মণ

বাঙালী ব্রাহ্মণ, শুধু বাংলার নয়, সমস্ত ভারতেরই গৌরবের স্থল। বিদ্যা, বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহারা কোন-জাতীয় ব্রাহ্মণ হইতেই ন্যূন নহেন, বরং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারশক্তিতে তাঁহাদের স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু আমরা এখন সে সকল গৌরবের কথা এখানে বলিব না। তাঁহাদিগকে বাংলার গৌরব বলিয়াছি, বাংলায় তাঁহারা কি করিয়াছেন তাহাই দেখাইব এবং সেই জন্য তাঁহাদের গৌরব করিব।

এই যে এত বড় একটা অনার্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য অব্রাহ্মণ ধর্মের এত প্রাদুর্ভাব ছিল, অথচ এখন এ দেশে জৈন বৌদ্ধ দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাহাদের কীর্তিকলাপ পর্যন্ত লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে,—চারিদিকের লোকে জানে বাংলা হিন্দু-ধর্মের দেশ— এটা কে করিল? কাহার যত্নে, কাহার দূরদর্শিতায়, কাহার নীতিজ্ঞানে এই দেশটা আর্য আচারে, আর্য বিদ্যায়, আর্য ধর্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? এ প্রশ্নের ত এক উত্তর। বাঙালী ব্রাহ্মণেরাই এই কাজটি করিয়াছেন। বাংলায় রাজশক্তি ত তাঁহাদের অনুকূল ছিল না, বরং অনেক স্থানে অনেক সময় ঘোর প্রতিকূলই ছিল। এই রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন, আর এমনি ভাবে সুসিদ্ধ করিয়াছেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জানেন না যে, তাঁহাদের আগমনের সময়েই এদেশে হিন্দু ছাড়া আরও একটা প্রবল ধর্ম ছিল। মুসলমানেরা

প্রাচীন সমাজ, বিশেষতঃ প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ, একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলে, তাহার পর কিরূপে ব্রাহ্মণেরা আবার ধীরে ধীরে সেই সমাজ আবার গড়িয়া তুলিলেন, তাহা পূর্বেই অনেকটা দেখাইয়াছি। স্মৃতি, দর্শন, বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষায় গান গাইয়া, বৌদ্ধেরা কেমন দেশটাকে মাতাইয়া তুলিত। সুতরাং দেশ মাতাইতে হইলে যে, মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, এ তাঁহাদের বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাংলা করা আরম্ভ করিয়া দেন।

এইরূপ করায় তাঁহাদের দুই কাজই হইয়াছিল। লোকের দৃষ্টি বৌদ্ধের দিক হইতে হিন্দুর দিকে পড়িয়াছিল এবং মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার হইবার একটা বেশ যন্ত্র হইয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ মুসলমানেরাও একথা বেশ অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ঘরের পয়সা দিয়া বাংলা লেখার সাহায্য করিতেন। বাস্তবিকই স্মৃতি ও দর্শন অপেক্ষা এই সকল বাংলা তর্জমায় হিন্দু সমাজের বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ তর্জমার মূলে ব্রাহ্মণ। এ কথাটা প্রথম তাঁহাদেরই মাথায় আসিয়াছিল এবং তাঁহারাই আগ্রহসহকারে এই কার্য করিয়া বাঙালীর গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

২০

কায়স্থ ও রাজা

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে কায়স্থদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। উঁহারা পূর্বেই বোধ হয় একটু দোটানায় ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁহাদের আগে বেশ শ্রদ্ধা ছিল, কেননা, অনেক কায়স্থ অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্মপালের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্যন্ত তাম্রে আমরা অনেক কায়স্থের নাম দেখিতে পাই। পরে, যখন তাঁহারা দেখিলেন বৌদ্ধ ধর্ম আস্তে আস্তে লোপ হইল, তখন তাঁহারা একেবারে ব্রাহ্মণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং ব্রাহ্মণদের হইয়া পুরাণাদি বাংলা করিতে লাগিলেন। গুণরাজখাঁর কৃষ্ণমঙ্গল ও কাশীদাসের মহাভারত বাঙালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে। কাশীদাসের আরও দুই ভাই গদাধর ও কৃষ্ণদাস ভাল ভাল বই লিখিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক— বাঙালী হিন্দু হউক! কায়স্থেরা শুধু বই লিখিয়াই সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। এদেশের অনেক জমিই তাঁহাদের হাতে ছিল, জমিদারভাবেও দেশের ও সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ ও তাঁহার সন্তানসন্ততি বাংলার সুলতান না হইলে রায়মুকুট বড় কিছু করিতে পারিতেন না। হিরণ্য ও গোবর্ধন না থাকিলে চৈতন্য সম্প্রদায় গড়িতেই পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমন্ত খাঁ না থাকিলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজকে অর্থের জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। এইরূপে কায়স্থ-ব্রাহ্মণে মিশিয়া বাংলায় একটা প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিলেন।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ